অদ্ভুত আর্কিড

এইচ জি ওয়েলস

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

অদ্ভুত অর্কিড

(The Flowering of the Strange Orchid)

অর্কিড এমনই একটা ফুল, যা কেনার জন্যে পাগল হতে হয়, কেনার পরেও পাগল হয়ে থাকতে হয়। একটু একটু করে পাপড়ি মেলে ধরে ফুল যতই ফুটতে থাকে, রং আর শোভা ততই মনকে মাতাল করে দেয়। নব নব আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে হয়।

এ নেশা পেয়ে বসেছিল ওয়েদারবার্নকেও। অর্কিড় জমানোর বাতিক তাকে নিত্যনতুন উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে গেছে। সারাজীবনটাই তার উত্তেজনাবিহীন। চৌকস মানুষ মোটেই নয়। লাজুক। নিঃসঙ্গ। পয়সাকড়ি যা আছে, তাতে প্রয়োজন মিটে যায়, কিন্তু এমন উদ্যম নেই যে, চাকরিবাকরি জুটিয়ে নেয়। ডাকটিকিট জমানো, হোরেস অনুবাদ, বাঁধানো বই কেনা, ডায়াটমের নতুন প্রজাতি আবিষ্কার–এইসব করেই সময় কাটালে পারত। কিন্তু পেয়ে বসল অর্কিড় জমানোর বাতিকে। ছোট্ট একটা হট-হাউস বানিয়ে নিয়েছে নিজেই। কাচের ছাদওয়ালা উষ্ণ গৃহ। গাছপালা পরিবর্ধন আর ফল পাকানোর মোক্ষম ব্যবস্থা।

সকালবেলা কফি খেতে খেতে গল্প হচ্ছে গৃহকত্রীর সঙ্গে। মেয়েটি তার খুড়তুতো বোনও বটে। স্বভাবে ভাইয়ের ঠিক বিপরীত। ঘরসংসার নিয়ে দিব্যি আছে। খামকা উত্তেজনার পেছনে দৌড়াতে চায় না।

কিন্তু গজগজ করে চলেছে ওয়েদারবার্ন। সারাজীবনটাই তার কেমন ভিজে-ভিজে। অন্য লোকদের জীবনে কত রকমের বৈচিত্র, কত অ্যাডভেঞ্চার, কত বিপদ ঘটে। কিন্তু তার জীবনটা ছেলেবেলা থেকেই বড় একঘেয়ে, শৈশবে পড়তে হয়নি প্রেমে–ফলে, বিয়ে থা-ই হল না। অথচ ওই যে হার্ভে–সোমবারে কুড়িয়ে পেল ছপেনি মুদ্রা, বুধবারে টলতে লাগল সমস্ত মুরগিছানা, শুক্রবারে অস্ট্রেলিয়া থেকে এল খুড়তুতো ভাই, শনিবারে ভাঙল গোড়ালি! অহো! অহো! উত্তেজনার এহেন ঘূর্ণিঝড়ে ওয়েদারবার্নকে কখনও পড়তে হয়নি। এর চাইতে পরিতাপের বিষয় আর হয় কি? তবে হ্যাঁ, কফির দ্বিতীয় কাপে ধীরেসুস্থে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল ওয়েদারবার্ন–আজ একটা নতুন কিছু ঘটবে মনে হচ্ছে। কেন না, আজ সে যাচ্ছে আন্দামান আর ইন্ডিজ থেকে আনা কিছু উদ্ভিদ কিনতে।

যার কথা সেদিন তুমি বলছিলে? প্রশান্ত কণ্ঠে বলেছিল বোন।

হ্যাঁ। তাই অর্কিড বেচে দিচ্ছে পিটার দোকানদার।

অর্কিড জমানোর বিষম বাতিক ছিল বুঝি?

সাংঘাতিক। অথচ বয়সে আমার চাইতে তেইশ বছরের ছোট। মোটে ছত্রিশ, এই বয়সের কতরকম উত্তেজনা যে পেয়েছে, তার হিসেব নেই। মারা গেল উত্তেজনা কুড়াতে কুড়াতেই। বিয়ে করেছিল দুবার, বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছিল একবার। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়েছিল চারবার। ঊরুর হাড় ভেঙেছিল একবার। একবার একটা মালয়বাসীকে খুন করেছিল নিজের হাতে, নিজেই একবার জখম হয়েছিল বিষাক্ত তিরে। শেষকালে মারা গেল জঙ্গলের জোঁকের পাল্লায় পড়ে–শুধু এই জোঁকের ব্যাপারটা ছাড়া বাদবাকি সবই দারুণ ইন্টারেস্টিং, তা-ই না?

আমার কাছে নয়, বলেছিল বোন।

তা অবশ্য নয়। আটটা তেইশ বাজল। পৌনে বারোটায় ট্রেন। চললাম।

বাড়ি ফিরল ওয়েদারবার্ন বিষম উত্তেজনা নিয়ে। না বুঝেই কিনে ফেলেছে কিছু অর্কিড, উত্তেজনা সেই কারণেই। অজ্ঞাত অর্কিডের রহস্য বেশ মাতিয়ে তুলেছে তাকে।

ডিনার খেতে খেতে বোনকে বলছিল সেই কথাই। নিশ্চয় আশ্চর্য কিছু এর পর থেকে ঘটবেই। আজ থেকেই যে তার শুরু, সকালেই তা টের পেয়েছিল। কয়েকটা অর্কিডের নাম সে জানে। কিন্তু এই যে এই অর্কিডটা, প্যালিনোফিস হতে পারে, না-ও পারে, একেবারে নতুন প্রজাতি অথবা একটা মহাজাতি হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু সেই। ব্যাটেন। বেচারা নাকি এই অর্কিডটাই সংগ্রহ করার পর মারা গিয়েছিল।

বোন বললে গম্ভীর মুখে, জঘন্য দেখতে–গা শিরশির করছে। মা গো। কী কদাকার চেহারা!

ভাই বললে সঙ্গে সঙ্গে, দূর! আমার চোখে ওর কোনও চেহারাই ধরা পড়ছে না।

গা থেকে ওই যে কী সব বেরিয়ে রয়েছে–কী বিশ্রী! কী বিশ্রী!

কালকেই তো টবে পুঁতে দেব।

মড়ার মতো মটকা মেরে রয়েছে–ঠিক যেন একটা মাকড়সা।

মুচকি হেসে ঘাড় কাত করে শেকড় পর্যবেক্ষণ করতে থাকে ওয়েদারবার্ন।

বলে, আহামরি দেখতে নয় মানছি। কিন্তু শুকনো চেহারা দেখে কিছুই আঁচ করা যায় না। দুদিন পরে ওই থেকেই এমন অর্কিড গজিয়ে উঠবে–তাক লেগে যাবে। তখন তুমিই বলবে–আহা রে, কী সুন্দর! কী সুন্দর! ব্যাটেন বেচারা মরে পড়েছিল ঝোপের মধ্যে এই অর্কিডের ওপরেই–আন্দামান জায়গাটা অতি যাচ্ছেতাই। ঝোপঝাড়ের মধ্যে কতরকম মৃত্যু যে লুকিয়ে থাকে, কেউ জানে না। রক্তচোষা জোঁক শরীর থেকে নাকি সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছিল। এই অর্কিড খুঁজতে গিয়েই ঝোপে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল নিশ্চয়–তারপর পড়েছে জোঁকদের পাল্লায়। দিনকয়েক নাকি জ্বরে বেহুশ হয়ে ছিল।

শুনে আরও কুৎসিত লাগছে তোমার অর্কিডকে।

বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে ওয়েদারবার্ন বললে, মেয়েরা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও পুরুষরা নিজেদের কাজ করে যাবেই–কেউ আটকাতে পারবে না।

ঝোপের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই। বিশেষ করে আন্দামানে–যেখানকার ভয়ানক জংলিরা সেবা করতেও জানে না। সময়মতো কুইনাইন আর ক্লোরোডাইনও জোটে না!

মানছি। কিন্তু ওইরকম কষ্টভোগই কিছু মানুষের খুব ভালো লাগে, বলে ছিল ওয়েদারবার্ন নাছোড়বান্দার মতো। আন্দামানে ব্যাটেন কিন্তু যে জংলিদের সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিল, তারা কিছুটা সভ্যভব্য ছিল। তাই ব্যাটেনের অতিকষ্টে সংগ্রহ-করা কোনও

অর্কিডই ফেলে দেয়নি–যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। তারপর এসে পৌঁছাল ওর এক পক্ষীবিজ্ঞানী বন্ধু, আন্দামানের গভীর জঙ্গল থেকে। ততদিনে সব কটা অর্কিডই শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। শুকনো বলেই কিন্তু আমার আরও ইন্টারেস্টিং লাগছে।

আমার লাগছে ডিজগাস্টিং, গা-পাক দিচ্ছে দেখলেই। গায়ে যেন ম্যালেরিয়া লেগে রয়েছে এখনও। পাশেই যেন একটা লাশ পড়ে রয়েছে–দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। খাওয়ার দফারফা হয়ে গেল আমার–এ জিনিসকে সামনে রেখে খাওয়া যায়?

শুকনো অর্কিডগুলো টেবিলের ফরসা কাপড়ের ওপর রেখে এতক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিল ওয়েদারবান। বোনের বিতৃষ্ণা দেখে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখল জানলার গোবরাটে। ফিরে এসে বসল টেবিলে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল দূরের বিশুদ্ধ কদাকার আকারহীন পিণ্ডের মতো অর্কিডগুচ্ছের পানে।

পরের দিন বিষম ব্যস্ত হল অর্কিড় পরিচর্যায়। কাঠকয়লা, শেওলা এবং আরও অনেক উপাদান নিয়ে বাষ্পচ্ছন্ন হট-হাউসে তন্ময় হয়ে রইল অর্কিডের সেবায়। অর্কিডপ্রেমিকরা জানে, কতরকম রহস্যজনক পন্থায় তরতাজা করে তুলতে হয় বিচিত্র সৌন্দর্যের আকর অর্কিড চারাদের। ওয়েদারবানও শিখেছে অনেক কিছু। সন্ধেবেলা বন্ধুদের ডেকে এনে সোৎসাহে দেখাল মৃতপ্রায় শুষ্ক অর্কিড সংগ্রহ। বারবার বলে গেল একই কথা–অচিরেই এই মড়াদের সে জাগাবে–তখন চিত্তচাঞ্চল্যকর অনেক ঘটনা নিশ্চয় ঘটবে–প্রত্যাশা তার বিফলে যাবে না।

কিন্তু এত সেবাশুশ্রূষা সত্ত্বেও মরেই রইল বেশ কয়েকটা ভান্দাস আর দেনড্রোবিয়াম। তারপরেই অবশ্য প্রাণের সঞ্চার দেখা গেল অদ্ভুত অর্কিডের মধ্যে। জ্যাম তৈরি নিয়ে ব্যস্ত বোনকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল আশ্চর্য আবিষ্কারটা দেখানোর জন্য।

বললে, ওই দেখ কুঁড়ি। দুদিন পরেই দেখবে কুঁড়ির জায়গায় গোছা গোছা পাতা। আর ওই যে খুদে খুদে কী সব বেরিয়ে রয়েছে, ওগুলো শেকড়, বাতাসের মধ্যে মেলে-ধরা শেকড়।

বোন বললে, জঘন্য। ঠিক যেন সাদা সাদা আঙুল। আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না।

কেন লাগছে না?

তা তো বলতে পারব না। শুধু মনে হচ্ছে, আঙুলগুলো বেরিয়ে আসছে তোমাকে ক্যাঁক করে ধরবার জন্যে।

বলিহারি যাই তোমার মনে-হওয়াকে।

আমার পছন্দ-অপছন্দের ওপর খবরদারি করার কোনও ক্ষমতা আমার নেই, যা মনে হল তা-ই বললাম।

তবে হ্যাঁ, এরকম বাতাসে মেলে-ধরা শেকড়ওয়ালা অর্কিড জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, স্বীকার করে ওয়েদারবার্ন। ডগাগুলো কীরকম চ্যাপটা দেখেছ?

শিউরে উঠে সরে যায় বোন, মোটেই ভালো লাগছে না আমার। কেন জানি না বারবার একটা মড়া মানুষের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কী আশ্চর্য! ঠিক এই অর্কিড়টার ওপরেই ব্যাটনের লাশ পড়েছিল, তা জানছ কী করে? অন্য অর্কিডও তো হতে পারে?

তুমিই বলেছিলে।

আমি আন্দাজে বলেছিলাম।

যা-ই বল, ওই কদাকার চেহারা দেখলেই আমার গা শিরশির করছে।

আহত হল ওয়েদারবার্ন। প্রাণপ্রিয় অর্কিডকে এত ঘেন্না করার কোনও মানে হয়? তা সত্ত্বেও কিন্তু ফুরসত পেলেই অর্কিড সমাচার শুনিয়ে গেল বোনকে, বিশেষ করে অতি কদাকার বিবমিষা-জাগানো অদ্ভুত অর্কিডটার কোনও খবরই বাদ দিলে না।

একদিন বললে, অনেক বিস্ময়, অনেক চমক, অনেক অদ্ভুত কাণ্ড জঠরে নিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে এই অর্কিডরা। ডারউইন অর্কিড় নিয়ে গবেষণা করে বলেছিলেন, মামুলি অর্কিড ফল এমনভাবে গড়া, যাতে এক চারা থেকে আরেক চারায় পরাগরেণু বয়ে নিয়ে। যেতে পারে মথ। কিছু অর্কিডের ক্ষেত্রে অবশ্য তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। গর্ভাধান এভাবে সম্ভব হয় না। যেমন ধর, সাইপ্রিসোডিয়াম। গর্ভাধান ঘটানোর মতো কোনও পোকার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। কয়েকটার মধ্যে তো বীজের চিহ্নও দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও তারা বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে গেছে বহাল তবিয়তে।

কীভাবে?

সরু নল আর শুড় দিয়ে। কিন্তু ধাঁধাটা অন্য জায়গায়। ফুলগুলো তাহলে ফোটে কেন?

তোমার জানা নেই?

উঁহু। কে জানে, আমার এই অর্কিড়টাও হয়তো অসাধারণ ঠিক সেইভাবেই। ডারউইনের মতো আমারও সাধ যায় গবেষণা করার। এদ্দিন সময় পাইনি–একটা-না একটা বাগড়া পড়েছে। পাতা মেলে ধরা কিন্তু আরম্ভ হয়ে গেছে–এসো-না, দেখে যাও।

বয়ে গেছে বোনের। ঘাড় বেঁকিয়ে সরাসরি জানিয়ে দিলে, অদ্ভুত অর্কিডকে নিয়ে খামকা সময় নষ্ট করতে সে রাজি নয়। কিলবিলে শুড়গুলো দেখে ইস্তক দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গেছে তার। এর মধ্যেই প্রতিটা শুড় ফুটখানেক লম্বা হয়ে গেছে দেখে এসেছে। দেখেই লোমটোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। বীভৎস প্রাণীবিশেষের ভয়াবহ শুড়ের কথাই মনে হয়েছে বারবার। স্বপ্নে দেখেছে, অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে প্রতিটা শুড় বেড়ে উঠে লকলক করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। অতএব, ওই বিদঘুটে গাছকে ইহজীবনে আর দেখতে সে রাজি নয়।

কী আর করা যায়। বেচারি ওয়েদারবার্ন একা একাই তারিফ করে গেল অদ্ভুত অর্কিডের আশ্চর্য শোভার। চকচকে গাঢ় সবুজের ওপর ঘন লালের ছিটে আর ডোরা এমনভাবে নেমে এসেছে তলার দিকে যে, অবাক না হয়ে নাকি থাকা যায় না। এরকম বাহারে পাতা জীবনে সে দেখেনি। গাছটাকে রেখেছিল একটা নিচু বেঞ্চির ওপর। কাছেই।

রয়েছে একটা থার্মোমিটার। টবের গা ঘেঁষে একটা জলের কল। টপটপ করে সমানে জল পড়ছে গরম জলের পাইপে–বাষ্প ভরিয়ে রেখেছে বদ্ধ বাতাসকে। প্রতিটা অপরাহু এহেন পরিবেশে কাটায় ওয়েদারবার্ন–অদ্ভুত অর্কিডের আশ্চর্য ফুল ফোঁটা নিয়ে কত বিচিত্র সম্ভাবনার কথাই না ভাবে আপন মনে।

অবশেষে একদিন স্বপ্ন সফল হল তার–ফুল ধরল গাছে। কাচের ঘরে ঢুকেই টের পেয়েছিল, প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে এতদিনে। প্যালেনিফিস লোয়ি অর্কিড কোণ জুড়ে থাকায় প্রাণপ্রিয় অর্কিডকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আশ্চর্য একটা সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। অত্যন্ত কড়া অথচ মিষ্টি একটা সুবাস। ছোট্ট, বহু অর্কিড বোঝাই সবুজ ঘরের সব গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে সেই সুগন্ধ।

তৎক্ষণাৎ হনহন করে প্রায় ছুটে গিয়েছিল অদ্ভুত অর্কিডের দিকে। চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল তিন-তিনটে বিরাট ফুল দেখে। এত গন্ধ বেরচ্ছে এই তিনটে ফুল থেকেই। তনু মন যেন অবশ করে আনছে মাতাল-করা সেই সুবাস। থ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল টবের সামনে দুই চোখে বিপুল প্রশংসা নিয়ে।

সত্যিই অপূর্ব। সাদা ফুল। পাপড়িগুলোয় সোনালি-কমলা ডোরা। তলার দিকে ছোট পাতা কুণ্ডলী পাকিয়ে সুক্ষ্ম জটিল খোঁচার মতো ঠেলে রয়েছে বাইরের দিকে। অত্যাশ্চর্য নীলচে-বেগুনি রঙে এসে মিশেছে সোনা-সোনা রং। দেখেই বোঝে ওয়েদারবার্ন বাস্তবিকই এ অর্কিড একেবারেই নতুন ধরনের একটা মহাজাতি। আর সে কী সুবাস! অসহ্য! গুমট বাতাসে আতীব্র সেই সুগন্ধ মাথা ঘুরিয়ে দেয় ওয়েদারবার্নের। তিন-তিনটে ফুল যেন দুলে দুলে ওঠে চোখের সামনে।

থার্মোমিটারটা আছে কি না দেখবার জন্যে এক পা এগতেই আচমকা যেন মাটি দুলে উঠেছিল পায়ের তলায়। পুরো সবুজ ঘরটাই যেন চরকিপাক দিতে শুরু করেছিল চোখের সামনে। ইট-বাঁধানো মেঝের প্রতিটা ইট যেন তাথই তাথই নাচ আরম্ভ করে দিয়েছিল। আবিল দৃষ্টিকে আবিলতর করে দিয়ে। পরক্ষণেই সাদা ফুল, সবুজ পাতা, গোটা সবুজ ঘরটা বোঁ করে ডিগবাজি খেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল শূন্যে–জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল অর্কিডপ্রেমিক ওয়েদারবার্ন।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ চা তৈরি করে মিনিট দশেক হাপিত্যেশ করে বসে থাকার পরেও ভাইকে না আসতে দেখে গজগজ করতে করতে সবুজ ঘরে এসেছিল বোন।

দরজা খুলে ডেকেছিল ভাইকে, জবাব পায়নি। বাতাস ভারী হয়েছে, লক্ষ করেছিল। নাকে ভেসে এসেছিল কড়া সুগন্ধ। তারপরেই চোখে পড়েছিল, গরম জলের পাইপের ফাঁকে কী যেন একটা পড়ে রয়েছে ইটের ওপর। মিনিটখানেক নড়তে পারেনি বোন। অদ্ভুত অর্কিডের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ওয়েদারবার্ন। শুড়ের মতো বাতাসে মেলে ধরা শেকড়গুলো এখন আর হাওয়ায় দুলছে না–দল বেঁধে একগোছা দড়ির মতো সেঁটে রয়েছে ভাইয়ের থুতনি, ঘাড় আর হাতের ওপর। প্রতিটা শুড়ের ডগা চেপে বসে রয়েছে চামড়ায়।

প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি বোন। তারপরেই দেখেছিল, পুষ্ট একটা শুঁড়ের তলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্তের সরু ধারা নামছে গাল বেয়ে।

অস্ফুট চিৎকার করে দৌড়ে গিয়েছিল বোন। জোঁকের মতো রক্তচোষা শেকড়গুলোর খপ্পর থেকে টেনেহিঁচড়ে মুক্ত করতে চেয়েছিল ভাইকে। ছিঁড়ে ফেলেছিল দুটো শুড়। টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়েছিল শুড়ের ভেতরকার থলি থেকে।

তারপরেই উৎকট হয়ে উঠেছিল কড়া সুগন্ধ। সে কী গন্ধ! সুবাস যে এত মিষ্টি অথচ এমন সংজ্ঞালোপকারী হয়–তা জানা ছিল না বোনের। বেশ বুঝেছিল, তার চৈতন্য কেড়ে নিচ্ছে ওই আশ্চর্য মিষ্টি ভয়ানক গন্ধ। মাথা ঘুরে উঠেছিল বনবন করে। আবছাভাবে দেখেছিল, রাশি রাশি শুড় পরম লোভীর মতো ভাইয়ের ওপর সেঁটে বসে রয়েছে তো রয়েছেই–শিথিল হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাজা উষ্ণ রুধির নিশ্চয় সেকেন্ডে সেকেন্ডে চালান হয়ে যাচ্ছে জীবিত দেহ থেকে কদাকার বিকট ওই উদ্ভিদের মধ্যে। এ অবস্থায় জ্ঞান হারালে তো চলবে না–কিছুতেই না। ভাইকে ফেলে রেখেই দরজা। দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসে খোলা হাওয়ায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভেবে নিয়েছিল, এরপর কী করতে হবে। বাইরে থেকে একটা ফুলের টব তুলে নিয়ে আছাড় মেরেছিল কাচের জানলায়। ফের ঢুকেছিল সবুজ ঘরে। পাগলের মতো নিস্পন্দ ওয়েদারবার্নের দেহ ধরে টান মারতেই হুড়মুড় করে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়েছিল অদ্ভুত অর্কিডের টব। চুরমার হয়ে গেলেও টবের ভয়াবহ উদ্ভিদটার একটা শুড়ও আলগা হয়নি ভাইয়ের থুতনি, ঘাড়, গাল থেকে। মরণ-কামড় একেই বলে। ছিনেজোঁক যেন। ক্ষিপ্তের মতো শেকড় আর টব সমেত ভাইকে টেনে এনেছিল বাইরে।

তারপর একটা একটা করে রক্তচোষা শেকড় ছিঁড়েছিল গা থেকে। মিনিটখানেকের মধ্যেই শেকড়মুক্ত দেহটাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মূর্তিমান বিভীষিকার নাগালের বাইরে।

দেখেছিল, ডজনখানেক চাকা চাকা দগদগে ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে ভাইয়ের থুতনি, ঘাড় আর গলা বেয়ে। সমস্ত দেহটা যেন রক্তশূন্য–সাদা! ঠিক এই সময়ে ঠিকে কাজের লোকটা বাগানে ঢুকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ভাঙা কাচ আর ওয়েদারবানের রক্ত মাখা অসাড় দেহ দেখে। তাকে দিয়েই জল আনিয়েছিল বোন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে রক্ত মুছে দিয়েছিল ভাইয়ের মুখ থেকে। ব্যাপার কী? চোখ খুলেই ফের বন্ধ করে ফেলে ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিল ওয়েদারবার্ন।

লোকটাকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিল বোন। ইতিমধ্যে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ভাই–একটু পরেই ফের জ্ঞান ফিরে পেয়ে চি-চি করে জানতে চেয়েছিল, ব্যাপারটা কী? এভাবে বাগানের মধ্যে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে কেন? বোনই বা কাঁদছে কেন?

হট-হাউসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে তুমি।

অর্কিডটা?

তার ব্যবস্থা আমি করছি।

ডাক্তার এসে ওয়েদারবার্নকে নিয়ে গেল ওপরতলায়। ব্র্যান্ডি আর মাংসের স্যুপ খাইয়ে তাকে চাঙ্গা করার পর বোন এল হট-হাউসে–সঙ্গে নিয়ে এল ডাক্তারকে।

ভাঙা জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস এসে কড়া এবং ভয়ানক মিষ্টি সেই গন্ধকে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছে বললেই চলে। ছেঁড়া শেকড়গুলো যেখানে যেখানে পড়ে, সেইসব জায়গায় ইটের

ওপর জমাট কালো রক্ত। বেঞ্চি থেকে টব উলটে পড়ায় ডাঁটি ভেঙে গেছে অর্কিড চারার। নেতিয়ে পড়েছে ফুল তিনটে। বাদামী হয়ে আসছে পাপড়ির কিনারা। সেইদিকে এক পা এগিয়েছিল ডাক্তার। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল একটা বাতাসে মেলে-ধরা শেকড়কে তখনও থিরথির করে কাঁপতে দেখে।

পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল, মেঝের ওপরেই পড়ে আছে অদ্ভুত অর্কিড। বিবর্ণ কালচে। পচন ধরেছে। হাওয়ায় দমাদম করে আছড়ে পড়ছে দরজা। শিউরে শিউরে উঠছে ওয়েদারবার্নের বিপুল অর্কিড-সংগ্রহ।

আর ওয়েদারবান? অতগুলো ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ায় কাহিল হয়ে পড়েছিল খুবই-তার বেশি কিছু নয়। বহাল তবিয়তে শুয়ে ছিল ওপরতলায়। মনে খুব ফুর্তি–অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চারের প্রসাদে বুক দশ হাত!